রোমিলা থাপার

ভারতে জাদুঘর: অতীত ও ভবিষ্যত

বিভিন্ন শৈল্পিক নিদর্শন সংগ্রহ করার জন্য অবসর এবং শৈল্পিক নিদর্শনের প্রতি সংবেদনশীল লোকেরা বহু শতাব্দী ধরে পরিচিত। তবে জনসাধারণের প্রদর্শনের জন্য জাদুঘরে বিভিন্ন ধরনের সংগ্রহ সংরক্ষণ বা প্রদর্শন করার সাম্প্রতিক ইতিহাস রয়েছে। ইউরোপে রেনেসাঁ এবং আলোকায়নের যুগে একটি ইউরোপীয় পরিচয়ের সন্ধানের অংশ হিসাবে এই চর্চাটা লালিত হয়েছিল। তখনকার ইউরোপের কাছে পরিচয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল, কারণ ইউরোপ তখন একটি আমূল পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল। চিরায়ত অভিজাতরা এবার একটি নব্য ধনিক মধ্যবিত্ত শ্রেণির কাছে পরাভূত হচ্ছিলেন; এবং উপনিবেশবাদ ইউরোপের সামনে ভিন্ন এক সংস্কৃতি হাজির করেছিল। হ্যানস স্লোয়েন এবং জোসেফ ব্যাংক এর মতো বহু প্রখ্যাত ব্যক্তিগত সংগ্রহকারীরা জ্ঞান ও অর্থের সংমিশ্রণে আগ্রহী ছিলেন। মূলত এটাই ছিল ব্রিটেনের কয়েকটি শীর্ষস্থানীয় জাদুঘরের প্রাণভোমরা। শিল্পায়নের সাথে ক্রমেই অর্থের যোগান বেড়ে চলেছিল এবং উপনিবেশিক উদ্যোগ সেই যোগানকে আরও বৃদ্ধি করছিল। পরিচয় বা আডেন্টিটি সংস্কৃতি ও শ্রেণির সংজ্ঞার সাথে জড়িয়ে পড়েছিল। ইউরোপীয় সংস্কৃতির শেকড় গ্রিক সংস্কৃতির মধ্যে নিহিত- এমন ভাবনার ওপর রেনেসাঁ গুরুত্ব দিয়েছিল, কিন্তু গ্রিক সংস্কৃতি অভিজাত ছাড়া ইউরোপের আপামর জনসাধারণের কাছে অপরিচিত ছিল। সুতরাং যখন জাদুঘরগুলো গড়ে উঠেছিল, তখন তারা ধ্রুপদী বা সেই গ্রিক সংস্কৃতি তৈরিতে অবদান রেখেছিল।

শিল্পের ব্যক্তিগত সংগ্রহ যা এক সময় মর্যাদার প্রতীক হয়ে উঠেছিল তা সবসময় পরিবারের সাথে থাকে নি। উনিশ শতকের দিকে তারা পাবলিক জাদুঘরের প্রাণভোমরা হয়ে উঠছিলেন; কেউ কেউ রাষ্ট্রীয় অর্থায়ন কর্তৃক সহায়তা পাচ্ছিলেন। বিশ্ব সংস্কৃতির মধ্যে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব দাবির

প্রয়োজনীয়তার সাথে এটা মিলে যায়; এই দাবি ঔপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী ক্ষমতার বৈধতা প্রদান করে। অন্যান্য সংস্কৃতি থেকে তাদের সেরা জিনিসগুলো ইউরোপীয় জাদুঘরে নিয়ে আসা ছিল এক ধরনের ক্ষমতা প্রদর্শন এবং অন্যান্য সংস্কৃতিকে দখল করার একটি প্রদর্শনও বটে। তুলনামূলক অধ্যয়নের জন্য ব্যবহৃত এই বিষয়গুলিকে সংস্কৃতির ক্রমাধিকারতন্ত্র বা হায়ার্কি হিসাবে চিত্রায়ন করা হয়েছিল।

জাদুঘরের উদ্দেশ্যটি ছিল শ্রেণিবদ্ধ পদ্ধতিতে বিভিন্ন নিদর্শন প্রদর্শন করা। সাধারণ শ্রেণিবিন্যাসটি ছিল মোটামুটি সরল। এটি শুরু হয়েছিল প্রাকৃতিক নিদর্শন ও মানুষের তৈরি নিদর্শনগুলি আলাদা করার মাধ্যমে। ভূতাত্ত্বিক নমুনা, উদ্ভিদ এবং প্রাণী জীবাশ্ম এবং কিছু সাম্প্রতিক নমুনা প্রথম বিভাগে অন্তর্ভুক্ত ছিল। চার্লস ডারউইন এবং কার্ল লিনিয়াসের শ্রেণিবিন্যাস ব্যবহার করে এগুলি সংগঠিত করা সহজ ছিল। মানুষের তৈরি নিদর্শনগুলি- ছোট মুদ্রা থেকে শুরু করে বিশাল স্মৃতিস্তম্ভ পর্যন্ত- শ্রেণিবদ্ধ করা আরও কঠিন; কেননা এর নিয়ত ছিল মানব বিবর্তনের সর্বজনীন ইতিহাসের সাথে এগুলোর সম্বন্ধ তৈরি করা। ঐতিহাসিক পরিবর্তনের জন্য দরকার প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা, যেন তা মানব জীবনের ধাপগুলোকে একটি সমাজের ইতিহাসে প্রয়োগ করা যায়। আদিম অবস্থার পর উন্নতির কাল পেরিয়েছে স্বর্ণযুগের সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছানো, এবং একসময় ধীরে ধীরে পতনের শুরু। তদপুরি, ইউরোপীয় সংস্কৃতি সর্বাগ্রেই ছিল।

২

ব্যক্তিগত সংগ্রহ এবং কিছু ক্রয় থেকে জাদুঘরে যা সংগ্রহ করা হয়েছিল সেগুলোকে 'পুরাকীর্তি' বা 'অতীতের প্রতীক' হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছিল। এগুলি অতীতের একটি ছবি সরবরাহ করতো। আলোকায়নের যুগে এই ক্রিয়াকলাপটি দুটো উপায়ে সম্প্রসারিত হয়েছিল। একটি ধারণা ছিল, জাদুঘরের উচিৎ হচ্ছে ভূতাত্ত্বিক এবং প্রাকৃতিক ইতিহাসের নিদর্শন প্রদর্শন করা। জাদুঘরকে জ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হবে। দ্বিতীয় ধারণা ছিল যে, জাদুঘরের উদ্দেশ্য হচ্ছে জনসাধারণকে [পাবলিক] শিক্ষা প্রদান করা। এক অর্থে জাদুঘর ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী একটি প্রতিষ্ঠান। কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজেরদের জাদুঘর ছিল, তবে এগুলি রক্ষাবেক্ষণের জন্য ব্যয়বহুল হয়ে উঠলে পরে তা বাদ দেওয়া হয়, যদিও ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় ও জাদুঘরের মধ্যে সংযোগটি বজায় ছিল।

ভারতের দিকে তাকালে দেখা যায়, প্রাথমিকভাবে জাদুঘর ছিল উপনিবেশ আরোপিত একটি প্রতিষ্ঠান। এর প্রতিষ্ঠা ভারত সম্পর্কিত জ্ঞানের ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গির ওপর নির্ভর ছিল; এটা ছিল ভারতীয় অতীতকে একটা পরিচয় দেয়ার স্বীকৃত মতাদর্শিক উদ্দেশ্য। কোন ব্যক্তি সংগ্রহকারীর পৃথক প্রচেষ্টা থেকে এখানে জাদুঘর গড়ে ওঠেনি। প্রাক-উপনিবেশ আমলে বিশেষ বিশেষ নিদর্শনের বহু সংগ্রাহক ছিলেন যেমন, তাঞ্জোরের সরফোজির সংগ্রহ, মুঘল রাজকুমারগণ, জৈন মঠের ভাণ্ডারদের এবং অভিজাত বা ধনী ব্যবসায়ীদের ছোট ছোট সংগ্রহ। বিশেষত পুরোনো ও দুষ্প্রাপ্য সচিত্র বিভিন্ন বইপত্র পাওয়া যেত। তবে এই সংগ্রহগুলো প্রাথমিকভাবে উপেক্ষিত হয়েছিল, সম্ভবত এই কারণে যে এতে প্রবেশাধিকার সীমাবদ্ধ ছিল। মুঘল আভিজাত্যের গ্রন্থাগারগুলি যদি সেখানে সংগ্রহ করা হতো তবে বইগুলোর মর্মান্তিক ক্ষয় হতো না। যাই হোক, প্রধান জাদুঘরগুলো ছিল রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, তাতে বাঁধা পড়েছিল ভারতের অতীত সম্পর্কে ঔপনিবেশিক ধারণাসমূহ। এমনকি যেখানে বিদ্যমান সংগ্রহগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল সেখানে সংগ্রহটি কে করেছে এবং কেন করেছে সে সম্পর্কে কদাচিৎ আলোচনা হয়েছে।

জাদুঘর সম্পর্কে ধারণা ধীরে ধীরে বদলাতে থাকে। এটি কেবল বস্তু সংগ্রহশালা হয়ে থাকে নি। বরঞ্চ একে এমন একটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে দেখা শুরু হয় যেখানে পরিবেশ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে নতুন জ্ঞানের প্রতিচ্ছবি থাকবে। এতে যুক্ত কিছু সংস্কৃতি আগে একদম অজানা ছিল। কিছু কিছু বস্তু যখন পাশাপাশি রাখা হলো তখন তাদের মধ্যে এমন এক সংযোগ দেখা গেলো যা আগে কল্পনাও করা যায়নি। পুরাতন কৌতূহলপূর্ণ কামরাটি এখন শিক্ষার প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠছে, এবং পাশাপাশি নান্দনিকতারও। ভারতে কৌতূহলপূর্ণ কামরা বা আজব ঘর সবক্ষেত্রে শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠেনি।

৩

ব্রিটিশরা ভারতে যা সংগ্রহ করা শুরু করেছিল তা মূলত তাদের নিজস্ব অনুসন্ধান-গবেষণা এবং অনুদান থেকে পেয়েছিল। এই বস্তুগুলো [অবজেক্ট] রাখার প্রয়োজনীয়তা কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি চত্বরে রেখে ইন্ডোলজির সাথে সংযুক্ত করার মাধ্যমে শুরু হয়েছিল। কিন্তু বস্তুগুলো স্থানকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। এরপরে এগুলো ১৮১৪ সালে প্রতিষ্ঠিত ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামে রাখার কথা ভাবা হয়। এটা ব্রিটিশ জাদুঘর প্রতিষ্ঠার প্রায় অর্ধ

শতাব্দী পরের কথা। ইতিহাস ও ঐতিহ্য উভয়ের জন্য জাদুঘরের অপরিহার্যতা সম্পর্কে ইউরোপের বেশ সচেতনতা ছিল তবে ভারতে সেটা ছিল কম ।

জাদুঘরগুলো ধীরে ধীরে বস্তুর সমান্তরাল অধ্যয়নকে উৎসাহিত করেছিল যা বিভিন্ন পাঠের [টেক্সট] সম্পূরক হয়ে উঠছিল। লিখিত পাঠ থেকে পাওয়া তথ্যগুলো থাকে স্পর্শাতীত এবং বিমূর্ত। অন্যদিকে বস্তু হচ্ছে স্পর্শনীয় এবং ত্রিমাত্রিক। বস্তুর বিপরীতমুখী অবস্থান প্রায়শই এক ধরেনের সংযোগ তৈরি করে বা ক্ষয়ের সৃষ্টি করে। অতএব এগুলোর সন্নিকৃষ্টতার ধরণটি গুরুত্বপূর্ণ। বহু শতাব্দী ধরে একই অঞ্চল থেকে সংগৃহীত বস্তুগুলোর মাধ্যমে বৃহৎ সংগ্রহশালা ঐতিহাসিক পরিবর্তনের অধ্যয়নকে তাগাদা দিয়েছিল। পরিবর্তনটি হতে পারে বস্তুগত, মাটি থেকে পাথরের, আবার পাথর থেকে ধাতব পদার্থ, অথবা রূপগত পরিবর্তনও হতে পারে। এ ধরনের সংগ্রহশালা বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত একই বস্তুর তুলনামূলক অধ্যয়নকেও সম্ভবপর করে তুলেছিল- এর সবচেয়ে আকর্ষণীয় উদাহরণ হলো বুদ্ধের প্রতিকৃতি। সুতরাং এভাবে বুদ্ধের গান্ধার, মথুরা ও অমরাবতী প্রতিকৃতি আসলে একই ব্যক্তির প্রতিনিধিত্ব করে; কিন্তু তিনটা তিন অঞ্চলের ভাস্কর্য, আকৃতগতভাবে তিনটা একেবারেই আলাদা। এই পার্থক্যের কেন্দ্রে আছে ঐতিহাসিক শৈলী এবং স্থানিক নান্দনিকতা।

৪

নিঃসন্দেহে সংগ্রহশালা তৈরির অনুপ্রেরণা এসেছে সংস্কৃতি ও এর সৃষ্টিকর্তাদের বিষয়ে কৌতূহল থেকে। তদপুরি একটা সংগ্রহকে রাখার জন্য প্রয়োজন শ্রেণিবদ্ধকরণ। শ্রেণিবিন্যাস ইতিহাস এবং নান্দনিকতার উভয় তত্ত্বের উপর নির্ভরশীল ছিল, যা আমরা জানি যে, নতুন জ্ঞানের সাথে তা পরিবর্তিত হয়। এগুলো উপনিবেশের ইতিহাস থেকে নেয়া হয়েছিল, ঔপনিবেশিক বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা রূপায়িত হয়েছিল এবং এটি ঔপনিবেশিক নীতির সাথে জড়িয়ে গিয়েছিল। এমনকি, অ-ইউরোপীয় সংস্কৃতিগুলোর সাথে ইউরোপীয় সংস্কৃতির বৃহত্তর সম্পর্কের ক্ষেত্রেও এর উপস্থিতি ছিল। ঔপনিবেশিক স্বার্থ এবং বুদ্ধিবৃত্তিক কৌতূহলের একত্রীকরণের ফলে অন্যান্য সংস্কৃতির প্রাচীন ইতিহাসের প্রতি আগ্রহকে ধাবিত করে। এর ফলে হায়রোগি-ফ পাঠোদ্ধারের মাধ্যমে মিসরিয় ইতিহাস পাঠ করার সুযোগ হয় এবং কীলকাকার লিপি (কিউনিফর্ম লিপি) প্রাচীন পশ্চিম এশিয়াকে জানার পথ বাতলে দেয়। এর সমান্তরালেই জেমস প্রিন্সেপ কর্তৃক ব্রাহ্মী লিপির

পাঠোদ্ধার হাজির হয়েছিল। প্রাচীন গ্রীক এবং লাতিন গ্রন্থে যে তথ্য উল্লেখ করা হয়েছিল তা থেকে বর্তমানে প্রাপ্ত প্রাচীন পৃথিবী সম্পর্কিত তথ্য তখন ভিন্ন হতে থাকে। তবে ইউরোপীয় পক্ষপাতিত্ব থেকেই যায় এবং ইতিহাসের উৎস হিসেবে এই গ্রন্থগুলি বা রচনাগুলির অগ্রাধিকার বজায় থাকে।

ঐতিহাসিক শ্রেণিবিন্যাস হয় বিষয় ভিত্তিতে না হয় কালানুক্রমিক ভিত্তিতে হয়েছিল। বিষয়ভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাস কিছুদূর অব্দি প্রাকৃতিক ইতিহাস থেকে সামাজিক ইতিহাস পর্যন্ত বিবর্তনের ধারণা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। কালানুক্রমিক শ্রেণিবিন্যাসের জন্য ঐতিহাসিক-রাজবংশীয় বর্গগুলোই রীতি হয়ে ওঠে। কোনও সংস্কৃতির বিবর্তনকে চিহ্নিত এবং বিশ্লেষণের প্রক্রিয়ায় অতীত সংস্কৃতিগুলির মধ্যে কোনো একটা আদর্শ হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছিল। ইউরোপ যদি গ্রিক শিল্পকে বেছে নেয় তবে ভারতের পছন্দ ছিল গুপ্ত আমলের শিল্প। কিন্তু বহু তর্ক-বিতর্ক এর পরে এটি বাছাই করা হয়েছিল। কেউ কেউ ইন্দো-বাক্ট্রিয়ান গ্রিক আমলের গান্ধার শিল্পকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন কারণ এটি হেলেনিস্টিক নান্দনিকতাকে অন্তর্ভুক্ত করেছিল, আবার অন্যরা এটিকে সঙ্কর রূপ হিসাবে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। ব্রিটিশ ভারতে কেন্দ্রীয়ভাবে অবস্থিত বিভিন্ন জায়গা থেকে যেসব ভাস্কর্য এসেছিল তাকে আর্য (আরিয়ান) বলে আখ্যায়িত করা হয়েছিল, যা ভারতের বিষয়গুলির সাথে এমন বর্গের ব্যবহার আরও বিভ্রান্তি যোগ করেছিল।

৫

নিদর্শন শ্রেণিবদ্ধ করতে ধর্ম এবং অভিজাতদের জীবন তুলে ধরে এমন নিদর্শনগুলিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল। এটা ভারতে আরো বেশি হয়েছিল, কারণ অতীত সম্পর্কিত ঔপনিবেশিক পাঠ অনুসারে ভারতীয়কে চিহ্নিত করার জন্য ধর্মকে একক ফ্যাক্টর হিসাবে দেখা হয়েছিল। এবং অবশ্যই অভিজাতরা সেই সময়ের ইতিহাসের উপাদান ছিলেন। এগুলোকে তখন, এবং এমনকি এখনও, জাদুঘরের জন্য মানানসই বস্তু হিসাবে গণ্য করা হয়। এটা অহেতুকই জ্ঞানের ক্ষেত্রকে সংকুচিত করে রেখেছিল। উদাহরণস্বরূপ, অতীতের সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক যন্ত্রগুলি, যা নান্দনিকভাবে অন্যান্য বস্তুর সাথে সমতুল্য ছিল (যেমন অ্যাস্ট্রোলেব, অর্থাৎ গ্রহ-নক্ষত্রের উন্নতি নির্ণয়ের জন্য মধ্যযুগীয় যন্ত্রবিশেষ), এগুলোকে গুরুত্ব দেয়া হয়নি। ফলে এগুলো খুব অল্পই ভারতের জাদুঘরে স্থান পেয়েছে। অ্যাস্ট্রোলেব কোন দেব-দেবী নয় এবং যদিওবা এগুলো দেব-দেবীর চাইতে মহাবিশ্ব সম্পর্কে

বেশি জানায়, কিন্তু এগুলোর অবস্থান হায়ার্কি বা ক্রমাধিকারের তলায় ছিল। এর একটা কারণ হলো অতীত কালের ভারতীয়দের যুক্তিবাদী এবং বৈজ্ঞানিক হিসাবে কখনো দেখা হয়নি, যদিওবা গণিত, চিকিৎসা এবং জ্যোতির্বিদ্যায় তাদের চমকপ্রদ অবদান ছিল। কিন্তু এই জিনিসগুলোই জাদুঘরে রাখা হওয়া উচিত ছিল কারণ ঐতিহাসিকরা যখন সভ্যতাকে কোনো একটা অনন্য ঘটনা হিসাবে না দেখে একটি সম্মিলিত প্রক্রিয়া হিসাবে সংজ্ঞায়িত করেন তখন আসলে এগুলো সম্পর্কেই কথা বলেন।

৬

কোন সংস্কৃতিটিকে আদি সভ্যতা হিসাবে বর্ণনা করা যেতে পারে এমন ধরনেরপ্রশ্ন দ্বারা উনিশ শতক আবিষ্ট ছিল। এই প্রশ্নগুলি আমরা এখন অপ্রাসঙ্গিক বিবেচনা করি। পৃথক পৃথক সভ্যতার ধারণা, যার প্রত্যেকটির সীমানা নির্ধারিত অঞ্চল, যারা একক প্রধান ভাষা এবং একক প্রভাবশালী ধর্ম রয়েছে- বর্তমানে এসব ধারণা বাতিল করা হয়েছে। এখন আমরা সভ্যতাকে বহুরঙ্গীয় ও চলমান প্রক্রিয়া হিসাবে পাঠ করি, যা যথেষ্ট মিলমিশের ওপর নির্ভরশীল ছিল। আঞ্চলিক নিয়ন্ত্রণ, ভাষার ব্যবহার এবং ধর্মের অনুশীলন সবকিছুই ক্রমাগত পরিবর্তন হয়। গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে এই পরিবর্তনটির গমনপথকে অনুসরণ করা এবং এর কতটা স্থানিক প্রভাবকের কারণে হয়েছে এবং কতটা অন্যান্য সংস্কৃতির মিথস্ক্রিয়ার ফলে উদ্ভূত হয়েছে তা নির্ধারণ করা। কোনও সংস্কৃতিই একা একটি দ্বীপ নয়। এই আন্তঃনির্ভরতাকে জাদুঘরে ফুটিয়ে তোলা প্রয়োজন। তদপুরি এর একটি চিত্তাকর্ষক উদাহরণ অক্সফোর্ডের অ্যাশমোলিয়ান জাদুঘরে প্রদর্শিত হচ্ছে। এই জাদুঘরে ভারতীয়, চীনা, মধ্য এশীয় এবং পশ্চিম এশীয় নিদর্শন রয়েছে। এদের চারটি পৃথক গ্যালারিতে সীমাবদ্ধ না করে সিল্ক রুটের থিমটি ব্যবহার করে চারটি অঞ্চলকে সংযুক্ত করা হয়েছে। এটি ছিল প্যান-এশীয় বাণিজ্য রুট যা চীন থেকে মধ্য এশিয়া হয়ে ভারত হয়ে পূর্ব ভূমধ্যসাগরে পৌঁছেছিল। এর সময়কাল ছিল প্রায় প্রথম সহস্রাব্দ। জাদুঘর এই চারটি অঞ্চল ও তাদের সংস্কৃতির মিথস্ক্রিয়াকে তুলে ধরে; একে অপরের ওপর কী ধরনের প্রভাব ফেলেছিল সে দিকেও আলোকপাত করে। সভ্যতার নতুন ধারণাটি কীভাবে সংজ্ঞায়িত করা উচিত এর মাধ্যমে তার অবিকল রূপ দেখা যায়। এটি ভারতীয় উপমহাদেশে, স্থলপথের রুট ও সমুদ্র যোগাযোগসহ, দুর্দান্ত প্রভাব ফেলতে পারে।

কখনো কখনো এটা বলা হয় যে, জাদুঘর প্রদর্শিত নিদর্শনকে তার পরিপ্রেক্ষিত থেকে সরিয়ে দেয়। হতে পারে এটি কোনও মন্দির বা স্টুপা

থেকে আনা কোনও ভাস্কর্য, অথবা হতে পারে সেটা মসজিদ বা সমাধিপাথর থেকে নেওয়া কোন ক্যালিওগ্রাফি কিংবা কোনো একটা বইয়ের ছোট পেইন্টিং- এগুলো যখন জাদুঘরে প্রদর্শিত হয় তখন এগুলোর কোনো পরিপ্রেক্ষিত বা কন্টেক্সট থাকে না। কন্টেক্সটকে স্বশরীরে উপস্থিত থাকতেই হবে এমনটা নয় তবে প্রতীয়মান করা উচিত। কিন্তু যখন বিচ্ছিন্নভাবে বস্তুটিকে নেয়া হয় তখন এটি পণ্যে রূপান্তরিত হয়ে যায়। এটি প্রায়শই এর বাণিজ্যিকীকরণের দিকে নিয়ে যায়। আর যখন এটি ঘটে তখন বিশেষজ্ঞের দুটি নতুন বর্গের জন্ম হয়। ব্যক্তিগত সংগ্রাহকেরা হয়ে উঠেন শিল্প সমজদার- যিনি কিনা শিল্প সম্পর্কে জানেন এবং বস্তুর প্রশংসা ও মূল্য দিতে পারেন। অপরজন হচ্ছেন এন্টিকোয়ারিয়ান ব্যবসায়ী, যার কাছে অতীতের বস্তুগুলো বেচা-কেনার পণ্য।

৭

কমোডিফিকেশন বা পণ্যায়ন প্রতিটি বস্তুর জন্য একটি মূল্য নির্ধারণ করে, এবং এটি সম্পদশালীদের কাছে একধরনেরবিনিয়োগ হয়ে ওঠে। এটি ব্যক্তিগত পৃষ্ঠপোষকতা নামক বর্গের প্রবর্তন করে; এবং যে সমাজ বাজার অর্থনীতির দিকে যাচ্ছে সেখানে এটা উচ্চ আয় বিনিয়োগের কার্যকর উপায় হয়ে দাঁড়ায়। এই জাতীয় সমাজের একটি মজার প্রবণতা হচ্ছে, প্রায়শই শিল্প বস্তুগুলোর সাথে জড়িত বাণিজ্যিক দিকটি সম্পদশালীদের স্ত্রীদের হাতে থাকে। এই প্রবণতা একটু কম বাণিজ্যিক উদ্যোগের রূপ দেয়।

ধনীদের এখন প্রাচীন জিনিসগুলিকে বিনিয়োগ হিসাবে বিবেচনা করার সাথে সাথে ব্যক্তিগত সংগ্রহশালা, এমনকি ব্যক্তিগত জাদুঘরগুলিও নিঃসন্দেহে সংখ্যায় বৃদ্ধি পাবে। রাষ্ট্রের তহবিলের উপর নির্ভরশীল জাদুঘরগুলি ধীরে ধীরে শিল্প বাজারের বিশেষ সামগ্রীর জন্য নিলামে পিছিয়ে যাবে। প্রায়শই দেশীয় বাজারের চেয়ে আন্তর্জাতিক বাজারের প্রভাবেই দাম নির্ধারিত হয়, যা উন্নয়নশীল অর্থনীতির জন্য এটাকে আরও ব্যয়বহুল করে তোলে। তবুও একজন ঐতিহাসিক হিসাবে আমি অনুভব করি যে কিছু উল্লেখযোগ্য বিষয় সরকারি বা পাবলিক জাদুঘরে থাকা উচিত। অন্যান্য দেশ যেভাবে এই সমস্যা মোকাবেলা করেছে সেগুলো আমাদের বিবেচনায় নেয়া উচিত। অবশ্যই এর মধ্যে অন্যতম হল, যে বস্তুগুলো নির্দিষ্ট জাদুঘরে দান করা হয়েছিল সেগুলো জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক কর সুবিধা প্রদান করা। ব্যক্তিগত বা বেসরকারী সংগ্রহের সমস্যা হচ্ছে, এন্টিককে পণ্যে রূপান্তরিত করার ফলে গবেষণায় এর কেন্দ্রিকতা হ্রাস পায়।

৮

সধারণ আলাপের জন্য এই যথেষ্ট। এবার ভারতীয় জাদুঘরের দিকে ফিরে তাকানো যাক, যার দু'শতম বার্ষিকী আমরা উদযাপন করছি। ১৮১৪ তে প্রতিষ্ঠিত জাদুঘরটি উনিশ শতকের শেষের দিকে ভূতত্ত্ব, প্রাণিবিদ্যা, নৃতাত্ত্বিক, প্রত্নতত্ত্বের পাশাপাশি শিল্প ও কারুশিল্পের সংগ্রহ ও প্রদর্শনের বস্তুগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে আরও বিস্তৃত হয়েছিল। মানব অস্তিত্বের এই সব দিকের অন্তর্ভুক্তি, সবকিছুকে আন্তঃসম্পর্কিত হিসাবে দেখা, এগুলো উনিশ শতকের বিবর্তন এবং জীবন ও সংস্কৃতির পাঠাতন সম্পর্কিত দর্শনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। তবে এক শতাব্দী আগে যা কিছু জ্ঞান হিসেবে বিবেচিত হতো তা আর এখন হয় না।

উদাহরণস্বরূপ, তৎকালে জাদুঘরে প্রদর্শিত এথনোগ্রাফির জ্ঞান জাতিগত ধরনের[রেসিয়াল টাইপস] ওপর হার্বার্ট রিজলির কাজ দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছিল। উনিশ শতকে 'রেস সাইন্স' পরিচিতি পায়। উপমহাদেশের বিভিন্ন ধরেনের সংস্কৃতিতে এটি রেসিয়াল লেবেল দিয়ে খুব উৎসাহের সাথে প্রয়োগ করা হয়েছিল। রিজলি মাথার খুলির ইনডেক্স এবং নাকের প্রস্থের তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। তবে বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে, রেস এর ধারণা বাতিল হয়ে গিয়েছিল। তবে যেহেতু আমরা এখনো রেস এর ধারণা ধারণ করি, সেহেতু জাদুঘরে সম্ভবত একটি ছোট প্রদর্শনী থাকতে পারে যেখানে ব্যাখ্যা দেয়া হবে যে, কেন রেস শ্রেণিবিন্যাসের একটা বর্গ হয়ে উঠেছিল এবং কেনইবা তা বাতিল হয়েছে।

৯

প্রাকৃতিক পৃথিবী থেকে মানব সৃষ্ট পৃথিবীর দিকে সরে যাওয়ার একটি অন্তর্নিহিত বার্তা ছিল। এটি আসলে প্রাকৃতিক অবস্থা থেকে আদিম অবস্থায়, এবং পরবর্তীতে সভ্য হওয়া পর্যন্ত অগ্রগতি দেখিয়েছিল। একটা বিশেষ উপায়ে অতীত প্রদর্শন করা আদতে একটি পদ্ধতি ছিল, যা দিয়ে বোঝানো হতো যে, যারা এটা পাঠ করেছেন তারাই এটা বুঝতে পেরেছিলেন। এই ধারণা আরো বহুকিছুর মধ্যে আরো একটি ধারণার জন্ম দিয়েছিল; ধারণাটি সবচেয়ে দুর্দান্তভাবে তৎকালীন জার্মান ইতিহাসবিদ লিওপোল্ড ভন রাংকে প্রকাশ করেছিলেন যে, ইতিহাস অতীতকে নিখুঁতভাবে উন্মোচন করতে পারে, বা অতীত আসলেই যেমন ছিল তেমনভাবেই ইতিহাস উন্মোচন করতে পারে। হিস্টোরিসিটি বা ঐতিহাসিকতা নির্ভর করবে আমাদের কাছে থাকা সূত্রগুলোর ওপর। এমন ধরনেরঅভিজ্ঞতাবাদ

উনিশ শতকেই খারিজ হয়ে গিয়েছে। তবুও, প্রত্নতত্ত্ব এবং জাদুঘর অতীতের বাস্তবতা আবিষ্কার এবং প্রদর্শন করতে পারে। কেবল বস্তু বা নিদর্শনকে সাজিয়ে রাখলেই ইতিহাসবিদ ও কিউরেটগণের পরিবেশিত বস্তুর নির্বাচন ও বিশ্লেষণের দায়-দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। নির্বাচন প্রক্রিয়াটি অনিবার্যভাবে, তা সচেতনভাবে হোক বা অবচেতনভাবে হোক, সেই তত্ত্বের সাথে যুক্ত, যা পরিবেশিত বস্তু/নিদর্শনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করবে।

জাদুঘর স্থাপনের পাশাপাশি এটি উল্লেখ করা হয়েছিল যে ঔপনিবেশিক শক্তি যে বিদেশী সংস্কৃতিগুলোকে শাসন করেছিল সেগুলো বোঝার দিকে মনোযোগ দিচ্ছে। তাদের মনোযোগের ধরনটা ছিল কর্তৃত্ববাদী বা স্বৈরশাসনমূল, মোটেও অংশীদারিত্বমূলক নয়। যেমন ১৯১০ অব্দি ভারতীয় মিউজিয়ামের বোর্ড অব ট্রাস্টির সদস্যদের মধ্যে হাতেগোনা কিছু ভারতীয় বাদে বেশির ভাগই ব্রিটিশ ছিলেন। ব্রিটিশদের একটা অংশ ছিলেন বিশেষজ্ঞ পেশাদার, এবং বাকিরা ছিলেন সরকারি কর্মচারী। পরের দলটি বিশেষত উদ্ভাবনী না হওয়াতে কাঠামো পরিবর্তনের দিকে খুব কমই উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এটি এমন একটি সমস্যা যা শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে এখনো বহাল তবিয়তে আছে। প্রশাসকরা ধরে নেন যে যে তারাও এই বিভাগে বিশেষজ্ঞ। বর্তমানে জ্ঞান যে গতিতে এগিয়ে চলেছে, তাতে প্রশাসক দূরের কথা, এমনকি বিশেষজ্ঞরাও তাল মিলাতে হিমশিম খান । দেখা যায় সময় মতো পরিবর্তন সাধন হয় না।

অনেক জাদুঘরের আর্টস বিভাগের গ্যালারিতে প্রদর্শিত জিনিসগুলো সাধারণত দেবতা এবং রাজকীয়তার সাথে যুক্ত হওয়ার কারণে উচ্চ মর্যাদার প্রতীক হিসাবে স্বীকৃত ছিল। প্রদর্শন গ্যালারিতে ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট বলতে একটা বিভাগ ছিল। এটা দিয়ে অত্যাধুনিক মেশিনে তৈরি বস্তুর বিপরীতে হাতে বানানো বা ন্যূনতম মেশিনের ব্যবহারে বানানো বস্তুকে বোঝান হতো। এই বিভাজনটা বিরক্তিকর এবং এটা নিয়ে যথেষ্ট আলোচনাও করা হয়নি।

১০

অতীতে কি শিল্পী (আর্টিস্ট) আর কারুশিল্পী বা কারিগর (ক্রাফটসম্যান) আলাদা ছিল? উভয়ই অজ্ঞাতনামা, কিন্তু বিরল ভাস্কর/খোদাইকর প্রাচীন আমলের সাথে যুক্ত এবং চিত্রশিল্পীরা মোঘল আমলের সাথে যুক্ত। আজ আমরা যাকে ধ্রুপদী শিল্প বলি তা কারুশিল্পী বা কারিগরদের সমাজ থেকে এসেছে, সাঁচি বা অন্যান্য উৎসের শিলালিপি দ্বারা এটা প্রমাণিত হয়। এর

বিপরীতে গ্রিক ধ্রুপদী ভাস্কর্যের সাথে যুক্ত স্বতন্ত্র শিল্পীর নাম চিন্তা করবে। একজন স্বতন্ত্র শিল্পী কখন থেকে স্বীকৃতি পেতে শুরু করলেন? এবং আজ আমরা যাকে 'শিল্প' বলে বুঝি তার অর্থটাই কী?

কারুশিল্প থেকে শিল্পকে আলাদা করার মাধ্যমে জনপ্রিয় (পপুলার) সংস্কৃতি এবং উচ্চ (হাই) সংস্কৃতি আলাদা হয়ে গিয়েছিল। তুলনামূলক দৈনন্দিন ব্যবহারের উদ্দেশ্যে কারুশিল্পীর কাজ এবং রাজকীয় ও বিশেষ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে সম্পাদিত কাজের মধ্যেও ফারাক ঘটে গিয়েছিল। যে কারিগর একজন দেব-দেবীর মূর্তি তৈরি করেন তিনি আসলে যিনি কাপড় বোনেন তার মতোই একজন কারিগর। তবে মূর্তির পবিত্রতা জাগতিক কাজকারবারের বাইরে মূর্তিকে একটি বিশেষ মর্যাদা দিয়েছিল। এই সমস্যাটি পূর্বে বেশ কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করেছিল, যার কোন যথেষ্ট উত্তর এখনও নেই। শিল্প কখন আর কারুশিল্প থাকে না? যারা এই বস্তুগুলি ব্যবহার করেছেন তারা কি এসবকে ক্রিয়ামূলক হিসাবে বিবেচনা করেছিলেন, নাকি নান্দনিক সামগ্রী হিসাবে বিবেচনা করেছিলেন? সম্ভবত কোনো নান্দনিক বস্তুকে ক্রিয়ামূলক কাজে ব্যবহার করতে কোনও সমস্যা হত না।

ধ্রুপদী এবং লোকজের মধ্যে পার্থক্যটি তৈরি হয় মধ্যযুগীয় সময়ে। দরবারি সংস্কৃতি প্রায়শই 'মার্গ' হিসাবে উল্লেখ করা হতো, দেশী বা লোকজ সংস্কৃতি থেকে একে আলাদা করা হতো। শিল্পী এবং কারিগরের মধ্যে এটিও কি একটি পরোক্ষ পার্থক্য ছিল? যে শিল্পীরা জাহাঙ্গীরের জন্য পাখি এবং প্রাণী এঁকেছিলেন তারা নিজেদের নামেই এটি করেছিলেন। তারা তাদের প্রশিক্ষণের নিয়মগুলো অনুসরণ করেছেন তবে তারা যদি চাইতেন তাতে নতুনত্ব আনতে পারতেন। ওই সময়ের কারিগররা বেনামেই থেকে গিয়েছেন, যদিওবা তারাও প্রযুক্তিগতভাবে প্রশিক্ষিত ছিলেন এবং নতুনত্ব দেখিয়েছিলেন।

১১

এর সাথে যুক্ত হলো মধ্যযুগীয় সময়কে কিভাবে আগের কালে দেখা হয়েছিল সেই প্রশ্ন। যে মহাকাব্যিক নায়কদেরকে প্রাচীন আমলের বলে অভিহিত করা হতো তাদেরকে মাঝে মাঝে মধ্যযুগীয় পোশাক ও ভঙ্গিতে ছবিতে হাজির করা হতো। তাদেরকে কি দূরের কোনো কালের মানুষ হিসাবে দেখা হচ্ছে, নাকি এটা ছিল অতীত থেকে তাদের ব্যক্তিত্বকে হালনাগাদ করার প্রচেষ্টা? আমরা আজ প্রাচীন চিত্রের হালনাগাদকে গ্রহণ

করেছি, তবে মহাকাব্যিক নায়কদের শার্ট এবং ট্রাউজারে আঁকা থাকলে শিউরে উঠতাম। সম্ভবত এটি ধারনা দেয় যে, মধ্যযুগে অতীতকে বর্তমানের সাথে আরও অবিচ্ছেদ্য হিসাবে দেখা হত, যেখানে আমরা অতীতকে দূরের এবং পৃথক হিসাবে দেখে আরও বেশি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি। তবুও, শিল্পশৈলী এবং পৃষ্ঠপোষকতার ব্যাপারগুলো জটিল বিষয়। বুন্দেলখণ্ডের ক্যান্ডেল্লা রাজারা খাজুরাহোর মধ্যযুগীয় মন্দিরের কয়েকটি সেরা ভাস্কর্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তা সত্ত্বেও, তারা মহোবার পূর্বপুরুষ দেবতা মানিয়াদেবী-র ছোট মন্দিরেরও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। মানিয়াদেবী অ্যানিকোনিক (চিত্রহীন) হলেও উপাসনায় ছিলেন এবং পরে শারদদেবীতে রূপান্তরিত হন। মানিয়াদেবী কি আইকন (মূর্তিতে) রূপান্তরিত হওয়ার জন্য খুব বেশি অস্পষ্ট ছিলেন? পাথরগুলোর মূল রূপটি রাখার জন্য কি অন্য কোনও কারণ ছিল, এমনকি এর পৃষ্ঠপোষকরা পুরাণের দেবদেবীদের সাথে মন্দিরকে যুক্ত করার পরও? অন্যান্য রূপগুলোও সাংস্কৃতিক বিন্যাসের অংশ ছিল- কেবল এটা দেখানোর জন্য কি আরো ক্ষুদ্র ও অ্যানিকোনিক দেব-দেবীকে জাদুঘরে রাখা উচিত নয়?

১২

১৮১৪ সালে জাদুঘরের ধারণার দিকে ফিরে আসা যাক। ব্রিটিশ জাদুঘর, অক্সফোর্ডের অ্যাশমোলিয়ান এবং প্যারিসের লুভরের মতো ইউরোপীয় জাদুঘরগুলো আসলে সেই সব কৌতূহলী ও গুরুত্বপূর্ণ জিনিসের সংগ্রহশালা যা অতীত সম্পর্কিত এবং যা দিয়ে ইউরোপীয় পরিচয় নির্মাণ করা যায়। জাদুঘর এই জিনিসগুলোকে গ্রহণ, সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং প্রদর্শন করেছে। এমনকি জাদুঘর উন্নত গবেষণার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল। এর জন্য প্রয়োজন পড়েছিল হালনাগাদ বই ও জার্নাল; সবার সদস্যপদের জন্য উন্মুক্ত ছিল। ১৯ শতকে ব্রিটিশ জাদুঘরের পাঠাগারটি কেবল একটি জাদুঘরের লাইব্রেরির চেয়েও বেশি কিছু ছিল। এটি ছিল বিভিন্ন বুদ্ধিজীবীর আশ্রয়স্থল যারা তাদের গবেষণা এবং তত্ত্বের মাধ্যমে বিশ্বের চেহারা পরিবর্তন করে ফেলেছিলেন। তাদের জন্য এক নিরাপদ আশ্রয়। লাইব্রেরিতে এখন একটি ফটোটেক এবং সংরক্ষণ ইউনিট যুক্ত করা হয়। সংরক্ষণের জন্য বস্তুকে কতটুকু পর্যন্ত পরিবর্তন করা যাবে এই বিতর্কটি ইউরোপে সমাধান হয়ে গিয়েছিল, তারা ন্যূনতমের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন। ভারতে এসব বস্তু/নিদর্শনের আদি রূপের পুনরুদ্ধার স্পষ্টতই দুঃখজনক ফলাফল বয়ে নিয়ে আসতে পারে।

নিদর্শনগুলি ঐতিহ্যের অঙ্গ হিসাবে সমাজের পরিচয় নির্মাণে অবদান রাখে- যখন নিদর্শনগুলিকে এমনভাবে দেখা হয় তখন এর নতুন আরেকটি মাত্রা যুক্ত হয়। এটি সেই বিন্দু যেখানে ইতিহাস জাদুঘরের কার্যক্রমে প্রবেশ করে। স্মরণ করা দরকার, ঔপনিবেশিককালে ভারতের হেজেমনিক ইতিহাস রচনা হিসাবে যাকে ধরা হয় সেই জেমস মিলের The History of British India প্রকাশিত হয়েছিল ১৮১৮ সালে। এটি ভারতীয় জাদুঘর প্রতিষ্ঠার সমসাময়িক ছিল। দুইয়ের মধ্যে কোনও যোগসূত্র ছিল? যুক্তি দেখানো যেতে পারে যে, সে সময়ে ভারতের অতীত সম্পর্কিত বোঝাপড়া (যা কিনা ঔপনিবেশিক ব্যাখ্যা থেকেই উৎসারিত হয়েছিল) প্রতিফলিত হয়েছিল সে সময়ের ইতিহাসে এবং প্রধান জাদুঘরগুলোর প্রদর্শনীতে।

মিল ভারতের ইতিহাসকে পর্যায়ক্রমে হিন্দু, মুসলিম এবং ব্রিটিশ কালপর্বে ভাগ করেন। এই পর্বায়নের কোন ভিত্তি না থাকা সত্ত্বেও এখনো চালু আছে। জাদুঘরের প্রদর্শনী এখনো সেই ধারণাটিকেই অনুসরণ করে চলছে। নিদর্শনগুলোর রাজবংশীয় বা ডাইনাস্টিক তকমা না দিয়েও কালানুক্রম বজায় রাখা যায়। যেখানে কোনও রাজবংশ শুঙ্গের মতো কম সময় ধরে শাসন করেছে, সেখানে সে রাজবংশের আমলে নির্মিত কোনো ভাস্কর্যকে সেই রাজবংশীয় আমলের সাথে চিহ্নিত করা সঠিক হবে, নাকি একটা বিস্তৃত সময়সীমার সাথে চিহ্নিত করা সঠিক হবে? কখনও কখনও পরিবর্তনের প্রকৃতি বুঝতে কারিগরিজাত রূপ বেশি সহায়তা করে। যেখানে মুরাল চিত্রকর্ম প্রথম সহস্রাব্দের প্রথম শতাব্দীতে প্রচুর ছিল, অন্যদিকে ক্ষুদ্র চিত্রকর্ম দ্বিতীয় সহস্রাব্দে আরও বেশি দেখা যায়। এই আমূল পরিবর্তনের জন্য কী দায়ী? নিশ্চয়ই কেবল কাগজের ব্যবহার নয়, যদিও সেটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। দরবারি রেওয়াজ ও শৈলীর পরিবর্তনও একাধিক ব্যাখ্যা সরবরাহ করতে পারে।

১৩

কালানুক্রম নিজেই বহুমুখী। অতীতের নিজস্ব এক সিলসিলা রয়েছে যার ওপরে আমরা আমাদের কালানুক্রমকে আরোপ করি। ফার্নানড ব্রদেল প্রতিটি ঐতিহাসিক ঘটনার সাথে প্রাসঙ্গিক সময়ের ত্রি-মাত্রিকতার কথা বলেছেন। এগুলি হলো, ঘটনা ঘটার সময়, ঘটনাটির দীর্ঘতর পটভূমি, এবং শেষে দীর্ঘকালীন ব্যাপ্তি। কয়েক শতক একটি ঘটনার জমিনের ছাঁচ তৈরি করে। এই সময়ের সাথে আরো একটা মাত্রা, মানে চতুর্থতম মাত্রা যুক্ত করা হয়েছে; তা হচ্ছে যখন একজন পর্যবেক্ষক একটি জাদুঘরে সেই বস্তুটিকে

হৃদয়ঙ্গম করে। আমি বলছি না যে, প্রতিটি বস্তুরই কালানুক্রমের এই তিনটি সময় পরিমাপে হওয়া উচিত, বরঞ্চ কেবল এটাই বলছি যে, এসবের চেতনা কালানুক্রমিক ভাষ্যে প্রতিফলিত হতে পারে।

১৪

কিছু বিরল ব্যতিক্রমসহ আমাদের জাদুঘরগুলিতে প্রদর্শিত নিদর্শনগুলি কেবল ধর্ম ও রাজবংশ ভিত্তিক পর্বকেই আমলে নিয়েছে, বাকি বর্গগুলোকে বিবেচনায় নেয়া হয়নি। যদিও ঐতিহাসিক কালপর্ব নিজেই এখন আমূল পরিবর্তিত হয়েছে। নতুন শ্রেণিবিন্যাসের জন্য অনুসন্ধান ইতিহাসবিদ এবং কিউরেটরদের মধ্যে একটি কার্যকর ক্রস-ডিসিপ্লিনারি অধ্যয়ন হতে পারে।

এটি নিদর্শনগুলিকে দেওয়া তকমার সাথেও যুক্ত। এই প্রবণতাগুলি আদতে মিনিমালিস্টিক; রাজবংশীয় এবং প্রয়োজন অনুসারে ধর্মীয় পরিচয় ভিত্তিক তথ্যাদি সরবরাহ করে। এগুলো সম্পূর্ণ বৈধ, কেননা এগুলো সুনির্দিষ্ট অর্থ ও পর্যাপ্ত তথ্য বহন করে। কিন্তু বহু দরকারি বিষয়ের অভাব রয়েছে। যেখানে কোনও চিত্র বা কারুকার্যকে কোনও প্রাসাদের সম্মুখভাগের কুলুঙ্গি থেকে নেওয়া হয়, তখন এটা কিছুটা ব্যাখ্যা সমেত বলা দরকার যে, প্রাথমিকভাবে যেখানে এটি ছিল সেখানে কেন এটি রাখা হয়েছিল, তার মূল অবস্থানটির কিছু গ্রাফিক উপস্থাপনাসহ এটি ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন রয়েছে। যেখানে কোনও চিত্রকর্ম একটি চিত্রিত পাণ্ডুলিপির অংশ ছিল, সেখানে শিল্পীর নাম ও তারিখ জানানোর পাশাপাশি আমাদের জানাতে হবে যে রচনাটি আসলে কোন বিষয়ে ছিল, কেন রচনা করা হয়েছিল এবং কে ও কোন ঘটনাটা এখানে চিত্রায়ন করা হচ্ছে। এমনকি যেখানে একই ধরনের গল্পের চিত্র রয়েছে, সেখানে বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলির দিকে নজর দেয়া দরকার।

এর মানে যা দাঁড়ায় তা হলো কিউরেটরদের খাটুনি বেড়ে যাওয়া কিন্তু এ ছাড়া জাদুঘরের উদ্দেশ্য সফল হয় না। এর আর এক অর্থ হলো তকমাগুলোকে ক্রমাগত হালনাগাদ এবং সংশোধন করতে হবে। যেখানে কোনও লেবেলের তথ্য বিতর্কিত সেখানে কমপক্ষে তার উল্লেখ থাকতে হবে। যদি সকল নিদর্শন/বস্তু একটি একক রাজবংশের অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহলে সেই আমলকে বোঝা যায় এমন বিভিন্ন যোগসূত্র ধরিয়ে দিতে হবে। আমি বলছি না যে, প্রতিটি গ্যালারি পাঠ্যবই হওয়া উচিৎ; বরঞ্চ বলছি যে গ্যালারিকে কেন এভাবে সাজানো হলো, এভাবে সাজিয়ে আসলে কী বলার চেষ্টা করা হচ্ছে এসব ব্যাখ্যা করা একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হতে পারে।

এটা দর্শনার্থীদের জন্য একটি সহজ উপায় করে দেয় যেন তিনি নিদর্শনগুলোকে বিচ্ছিন্নভাবে এবং একটি সংগ্রহ হিসাবে বুঝে নিতে পারেন। এই কাজের জন্য এখন বিভিন্ন ধরনের ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রাদি সহজেই কাজে লাগানো যায়।

১৫

কিউরেটর, শিল্প ইতিহাসবিদ এবং অন্যান্য পণ্ডিতরা প্রদর্শিত জিনিসপত্রের ইতিহাস এবং মূল্য সম্পর্কে ভালভাবে জানেন। তাদের জন্য, জাদুঘরটি এমন এক জায়গা যেখানে পুরানো ও ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলির সংগ্রহ, সংরক্ষ এবং প্রদর্শন করা হয়। কিন্তু বর্তমানে সর্বসাধারণকে শিক্ষিত করার ক্ষেত্রে জাদুঘরের ভূমিকা অনেক বেশি। এই দুটি দিক একে অপরের সাথে সম্পর্কিত। যদি প্রদর্শিত জিনিসগুলো জ্ঞানের জগতকে ঢুকতে না দেয় তবে জনসাধারণকে শিক্ষিত করার পথ বন্ধ হয়ে যায়। সুতরাং যদি কোনও জাদুঘর জনসাধারণের কাছে ভারতীয় সভ্যতার চাক্ষুষ প্রতিনিধিত্ব করার দাবি করে তবে সভ্যতার নিয়ে সাম্প্রতিক আলোচনার বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন হতে হবে। এক শতাব্দী আগে যে ধারণা ছিল তা কি আর এখনো চালু আছে?

জাদুঘরের মাধ্যমে জনসাধারনকে শিক্ষিত করার নিজস্ব সমস্যা রয়েছে। সংক্ষিপ্ত লেবেলওয়ালা বিচ্ছিন্নভাবে প্রদর্শিত একটি বস্তু তার অর্থ হারাতে থাকে। জনসাধারণ যা দেখছেন তা আংশিক, সাধারণত তার নান্দনিক মানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ওয়াল্টার বেঞ্জামিন যুক্তি দিয়েছেন যে এইভাবে প্রদর্শিত যে কোনো বস্তু একটি ঐতিহ্যে [ট্র্যাডিশন] খোদাই করা থাকে এবং যদি কেউ বস্তুর মহিমা (aura) সন্ধান করে তবে তা ঐতিহ্যের মধ্যেই রয়েছে। অন্যরা বলবেন যে জাদুঘর বস্তুকে ঐতিহ্য থেকে মুক্ত করে এবং অন্যান্য দিকগুলোকে তুলে নিয়ে আসে। তাহলে এই দিকগুলোর দিকে ইঙ্গিত করতে হবে।

ঐতিহ্য [হেরিটেজ] হিসাবে যা বিবেচনা করা হয় তারও অবস্থান হচ্ছে জাদুঘর। ঐতিহ্য নির্ধারণে কিছু সমস্যা রয়েছে। অতীতের পুঞ্জিভূত ঘটনাবলী থেকে এটা নেয়া হয়। এ হলো আগের একইরকম ঘটনাগুলো। আজ আমরা ঐতিহ্য হিসাবে যা বুঝি তা আমাদের পূর্বপুরুষরা সেটাকে ঐতিহ্য হিসাবে নাও দেখতে পারেন, তা আমরা যতই পিছনে যাই না কেন। এটা মনে রাখা ভাল যে বহু শতাব্দী ধরে মানুষ সম্রাট অশোক এবং তাঁর ধর্মের ধারণা সম্পর্কে অজ্ঞাত ছিল। পুরাণিক রাজাদের নামের

তালিকার কয়েক ডজন নামের মধ্যে তিনিও একজন মাত্র। কেবল বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা তাঁকে মনে রেখেছিলেন এবং মধ্যযুগে তাদেরকে নিরব করিয়ে দেয়া হয়েছিল। উনিশ শতকে তাকে নতুন করে আবিষ্কার করা হয়। কিন্তু আজ তাকে আমাদের জাতীয় ঐতিহ্যের অংশ হিসাবে দেখা হচ্ছে, যা কিনা দুই সহস্রাধিক বছর ধরে টানা চলে আসছে। এটি কীভাবে সম্ভব হলো এবং কেন? আমাদের ঐতিহ্য বৈচিত্রময় এবং বহুমুখী; এবং সমস্ত জাতীয় ঐতিহ্য নির্মাণের সাথে সাথে আমরা যে সংস্কৃতিগুলোকে জাতীয় হিসাবে বিবেচনা করি তা নির্বাচনের ক্ষেত্রে আমাদের মুশকিলে পড়তে হয়। আধিপত্যশালী সম্প্রদায়গুলোর সংস্কৃতিই সর্বদা মর্যাদা পেয়ে থাকে, এমনকি সেটা যদি সমজাতিক [হমোজেনাইজড] মোড়কে জাতীয় সংস্কৃতি হিসাবেও উপস্থাপন করা হয়; যেমনটা যে কোনো সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় থেকে করা হয়। এটি সবসময় বহু-সংস্কৃতির প্রতি সংবেদনশীলতাকে প্রতিফলিত করে না। ঐতিহ্যের সংজ্ঞাকে আরো অন্তর্ভূক্তিমূলক হওয়া দরকার।

১৬

পশ্চিমা বিশ্ব তার সংস্কৃতিকে একটি সরলরৈখিক গতিপথের মাধ্যমে সংজ্ঞায়িত করেছে, তবে বর্তমানে অভিবাসীদের নিজস্ব ঐতিহ্য নিয়ে আসার কারণে এটি চাপের মুখে পড়ছে। এখন থেকে কয়েক শতাব্দী পরে যখন অভিবাসীরা পশ্চিমা সমাজে মিশে যাবে তখন তাদের জাতীয় সংস্কৃতি কিভাবে সংজ্ঞায়িত হবে তা দেখতে চিত্তাকর্ষক হবে। প্রবাসে অভিবাসীরা কীভাবে তাদের নিজেদের ঐতিহ্যকে সংজ্ঞায়িত করে তা দেখতেও সমান চিত্তাকর্ষক হবে। এই চিত্রের উপাদানগুলো অনিবার্যভাবে কাল্পনিক [ইমাজিনারি] হবে এবং তা সময়ের সাথে সাথে বৃদ্ধি পাবে।

জাদুঘর একটি বার্তা বহন করে। ঔপনিবেশিক দিনগুলিতে এটি ছিল অতীতকে উপস্থাপন করার একটি বার্তা এবং ঘটনাক্রমে এ ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক বুদ্ধিবৃত্তি উপনিবেশের জন্য যা করেছিল তাকে গৌরবান্বিতও করা হয়েছিল। এই প্রচেষ্টা প্রশংসার দাবিদার, কিন্তু উদ্দেশ্যকে উপেক্ষা করা যাবে না। তবে দুই শতাব্দী পরে এর রূপরেখাতে পরিবর্তন এসেছে - জাদুঘর কী এবং এর কী কাজ উভয় অর্থেই পরিবর্তন এসেছে। আবেদনটি এখন আর ঔপনিবেশিক কর্তৃত্বের নয়, বরঞ্চ জনসাধারণকে সচেতন করে তার পরিচয় নির্মাণের চেষ্টা করা। এটি আমার মনে হয় গত দু'শো বছরে জাদুঘরের ধারণার একটি বড় পরিবর্তন। এই পরিচয়ের উপাদানগুলি জটিল কারণ এসব আর উনিশ শতকীয় পাণ্ডিত্যের কোন সংকীর্ণ সংজ্ঞা হিসাবে

থাকেনি। পরিচয়টি বিভিন্ন সংস্কৃতির সমন্বয়ে গঠিত সমাজকে প্রতিফলিত করতে হবে যাতে প্রতিটি সংস্কৃতি দৃশ্যমান হয়। এটি কেবল আমাদের সংস্কৃতির স্বীকৃতি নয়, বরঞ্চ এমন অন্যান্য অনেক সংস্কৃতির স্বীকৃতিও যার অংশ আমরাও এবং যাতে আমরা প্রতিনিয়ত অবদান রেখে চলছি। এই ধরনের প্রতিফলন কোন অসম্ভব কাজ নয়। তবে এর জন্য সংস্কৃতিগুলির প্রতি সংবেদনশীল হতে হবে এবং এর মধ্যকার মিথস্ক্রিয়াগুলোকে বুঝতে হবে।

জাদুঘরের ভবিষ্যতের জন্য প্রয়োজন জাদুঘরকে একটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে আবারো চিন্তা করা, বিশেষত এই জয়ন্তিতে। নিদর্শন/বস্তু প্রদর্শন করাই যথেষ্ট নয়। আমাদের ভাবতে হবে এটি কীভাবে এবং কেন করা হয়। আরও কার্যকর এবং প্রাসঙ্গিক উপায় আর কি আছে? আমরা অতীতকে কীভাবে দেখি এবং কিভাবে আমাদের বর্তমান সমাজের সাথে সম্পর্কিত করি এবং আমরা অতীতকে কীভাবে ব্যবহার করি- এসব বিষয়ে আমাদের ধারণাগত পরিবর্তনের সাথে সাথে জাদুঘরের উদ্দেশ্যও পরিবর্তিত হচ্ছে। ইতিহাস লেখার পাশাপাশি জাদুঘরও অতীত এবং বর্তমানের মধ্যস্থতা তৈরি করে। আর অতীত আমাদের বাইরের কিছু নয়, বরঞ্চ আমাদের অংশ। অতীতকে বুঝতে হবে, তবে পরিপ্রেক্ষিত আলাদা করে বিচ্ছিন্নভাবে নয়। আমি কেবল বারবার ওই মনোভাবকেই ব্যক্ত করবো যে, জাদুঘরের কাজ হচ্ছে অদৃশ্যকে দৃশ্যমান করে তোলা। এবং ভারতের নতুন জাদুঘরগুলোতে আমরা সবাই এটি দেখার অপেক্ষায় রয়েছি।

ভাষান্তর: রিফাত ফারজানা

* এই বক্তৃতা দেয়া হয়েছিল কলকাতাস্থ ভারতীয় জাদুঘরের দুইশত বছর উপলক্ষে আয়োজিত একটি সেমিনারে। (জানুয়ারি ২০১৪)
রোমিলা থাপারের অনুমতি নিয়ে অনূদিত ও প্রকাশিত।